সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● তৃতীয় বর্ষ ২য় সংখ্যা ● নভেম্বর ২০১৬ ● পাঁচ টাকা

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানবমুক্তির পথ দেখিয়েছিলো

১৯১৭ সালে ৭ নভেম্বর। সেদিন পৃথিবীর বুকে মাথা তুলেছিল প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী দুনিয়ার বুকে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে, শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনার সামর্থ্য রাখে। তারা সেই শ্রেণী যারা নিজের শ্রম দিয়ে এ বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছে এবং শ্রম ছাড়া যাদের দেয়ার মতো আর কিছুই নেই। তারা পুরনো সমাজের শোষণ-অন্যায়-অত্যাচারের সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিয়ে শোষণ-বৈষম্যহীন এক নতুন সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে। রাশিয়ার বিরাট সংখ্যক কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে তাদের মিত্র হিসেবে এ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। এ বছর ৭ নভেম্বর মহান রুশ বিপ্লব ৯৯তম বার্ষিকী পূর্ণ করে শততম বর্ষে পদার্পণ করছে। মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সেই রাষ্ট্র এক নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলো, দেখিয়েছিল - মানুষের উপর মানুষের শোষণ কোনো চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অসাম্য-বৈষম্য-শোষণের অবসান একমাত্র তখনই হতে পারে, যখন ব্যক্তিমালিকানা ও সর্বোচ্চ মুনাফাভিত্তিক এই ব্যবস্থার বদলে সামাজিক মালিকানা ও সুষম বন্টন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার সময়ে ইউরোপ-আমেরিকার যেকোনো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে থাকা সেই দেশ অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ঘোষণা করতে পেরেছিলো - এদেশে কোনো বেকার নেই, অভুক্ত নেই। নারীদেরকে সকল প্রকার অপমান-জবরদস্তি থেকে মুক্ত করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। রাষ্ট্রের উদ্যোগে সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলো। সাংবিধানিকভাবে প্রত্যেক কর্মক্ষম মানুষের কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। পুঁজিবাদী সমাজের সমস্ত নোংরামি সমাজ থেকে মুছে ফেলেছিলো। সে দেশে ভিখিরি ছিল না, বেশ্যাবৃত্তি ছিল না। নতুন এ সভ্যতার অভ্যুদয় অবাক চোখে স্বাগত জানিয়েছিলেন রমা রঁল্যা, বার্ট্রান্ড রাসেল, আইনস্টাইনসহ বিশ্ববরেণ্য মনীষীরা, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, নজরুল-এর মতো বড় মানুষেরা। রুশ বিপ্লব তাই মানব ইতিহাসে মহত্তম, সবচেয়ে গৌরবজনক ও দিকনির্দেশকারী ঘটনা।

বিপ্লবের শিল্পী, রূপকার ও স্থপতি - কমরেড লেনিন

জারের বিরুদ্ধে লড়াইরত প্রায় সমস্ত দলগুলো মিলে গড়ে তুলেছিল সোভিয়েত। সোভিয়েত কথাটির অর্থ পরিষদ। উৎপাদকদের বিভিন্ন স্তরের আলাদা আলাদা সোভিয়েত ছিল - যেমন শ্রমিকদের সোভিয়েত, কৃষকদের সোভিয়েত, সৈনিকদের সোভিয়েত প্রভৃতি। প্রতিটি শহর, নগর ও গ্রামে ছিল নির্বাচিত স্থানীয় সোভিয়েত, বড় বড় জেলাগুলোতে ছিল জেলা সোভিয়েত, ছিল আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক সোভিয়েত। রাজধানীতে সারা রুশ সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল। মার্চ বিপ্লবের পরপরই প্রায় সর্বত্র শ্রমিক প্রতিনিধিদের ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি সম্মিলিত হয়ে যায়। সোভিয়েতগুলোতে বলশেভিকরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ, কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবের আগে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলমান, ফ্রন্টগুলোতে সৈন্যরা তখন শান্তির জন্য ব্যাকুল, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, শ্রমিকরা একের পর এক বিরাট বিরাট ধর্মঘট করছে, কৃষকরা ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে জমির দাবিতে আন্দোলন করছে - এ সবকিছুকে এক নিপুণ শিল্পীর মতো একসূত্রে গেঁথে তুলেছিলেন লেনিন। তিনি বিপ্লবের সম্ভাবনা, পরিণতি, সংকট, তার সম্ভাব্য আঁকাবাঁকা পথ - সবকিছুকেই কাঁচের মতো স্পষ্ট দেখতে পেতেন। বিপ্লবের চারদিন আগে পেত্রোগ্রাদে একটি ঐতিহাসিক বৈঠক হয়েছিল বলশেভিক নেতাদের। সেখানে লেনিন বলেন, "৬ নভেম্বর খুবই আগে হয়ে যাবে। অভ্যুত্থানের জন্য আমাদের দরকার একটা সারা রুশ ভিত্তি, অথচ ৬ নভেম্বরের মধ্যে কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধি এসে পৌঁছাবে না। অন্যদিকে ৮ নভেম্বর খুবই দেরি হয়ে যাবে। ততদিনে কংগ্রেস বসে যাবে এবং মস্ত একটা সংগঠিত সভার পক্ষে দ্রুত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। আমাদের ঘা মারতে হবে ৭ তারিখেই, যেদিন কংগ্রেস শুরু হবে, যাতে কংগ্রেসকে আমরা বলতে পারি, 'এই রইল ক্ষমতা! বলুন কি করবেন?' "

বিপ্লবের আগের দিন অর্থাৎ ৬ নভেম্বর লেনিন দলের কেন্দ্রীয় কমিটিকে একটি চিঠি দেন। সেখানে তিনি বলেন, "আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে কমরেডদের এই সত্য অনুধাবন করতে আহবান করছি যে, সমগ্র বিষয়টাই এখন সুতোয় ঝুলছে; আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তা সম্মেলন বা কংগ্রেস করে (এমনকি সোভিয়েতগুলোর কংগ্রেস করে) সমাধান করা যাবে না, এর সমাধান একমাত্র জনগণ, ব্যাপক জনগণ, সশস্ত্র জনগণের সংগ্রামের দ্বারাই সম্ভব। . . . বিপ্লবের সাফল্য, শান্তি প্রস্তাব, পেত্রোগ্রাদের মুক্তি, দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি, চাষীর হাতে জমি দেয়া - এ সবই বিপ্লবীদের উপর নির্ভর করছে। একথা জেনেও এ সুযোগ হাতছাড়া করা বিপ্লবীদের পক্ষে সীমাহীন অপরাধ। দুনিয়ার সকল বিপ্লবের ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়।"

বাস্তবিকপক্ষে লেনিনের সেই দিনের সেই সঠিক বিশ্লেষণ, পরিস্থিতির সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে পারার ক্ষমতা, সামান্যতম দ্বিধাদ্বন্দ্বহীনভাবে জনগণের উপর প্রবল আস্থা রাখতে পারার মন - এ সবকিছুই সেদিন নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিজয়ী করেছিল। তাই কমরেড স্ট্যালিন লেনিন সম্পর্কে বলেছিলেন, "লেনিন জন্মেছিলেন বিপ্লবের জন্য। সত্যই তিনি ছিলেন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মহত্তম প্রতিভা, বিপ্লবী নেতৃত্বের সর্বোত্তম শিল্পী।" *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শত বাধা উপেক্ষা করেও সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন চলছে

সিলেটে ছাত্রলীগের হামলা ছাত্র ফ্রন্টের ১০ নেতা-কর্মী আহত

সুন্দরবনের রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে সিলেটের মদন মোহন কলেজে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট আয়োজিত তথ্যচিত্র প্রদর্শনীতে ২৫ অক্টোবর ছাত্রলীগের হামলায় ১০ ছাত্র ফ্রন্ট নেতা-কর্মী আহত হন। সকাল ১০টায় তথ্যচিত্র প্রদর্শনী শুরু হবার পর বিরাট সংখ্যক সাধারণ শিক্ষার্থীরা উৎসাহ নিয়ে দেখতে আসেন। বেলা ১২টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা ইফতেকারুল আহমেদ সুমন, রাজেশ সরকারের নেতৃত্বে অর্ধশতাধিক সন্ত্রাসী প্রকাশ্যে দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। হামলায় আহত হয়েছেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদ, কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক রুবেল মিয়া, নগর শাখার স্কুল বিষয়ক সম্পাদক ফাহিম আহমেদ চৌধুরী, সদস্য মিজানুর রহমান, কলেজ শাখার সদস্য পলাশ কান্ত দাশ, সজীবুর রহমান, সুপান্ত রায় শুভসহ ১০ ছাত্র ফ্রন্ট নেতা-কর্মী। পরবর্তীতে ছাত্র ফ্রন্ট কর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধের মুখে সন্ত্রাসীরা পিছু হটে। আহতদের মধ্যে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন রেজাউর রহমান রানা, ফাহিম আহমেদ চৌধুরী, মিজানুর রহমান, সজীবুর রহমান সানী। ছাত্র ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, যুক্তির শক্তিকে প্রতিহত করতেই ছাত্রলীগ গায়ের জোর খাটাচ্ছে। তারা হামলাকারীদের প্রতিরোধ করার জন্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সাইকেল র‍্যালিতে ছাত্রলীগের হামলা ও পুলিশি বাধা এবং ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে জাতীয় কমিটির মিছিলে পুলিশের ন্যাক্কারজনক হামলা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে আয়োজিত সাইকেল র‍্যালি কর্মসূচি দফায় দফায় ছাত্রলীগের হামলা, পুলিশী বাধার মুখে পড়ে এবং ও ১৮ অক্টোবর ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে জাতীয় কমিটির মিছিলে পুলিশ হামলা করে। দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন চলমান থাকার কারণে মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। দেশের বামপন্থী শক্তি শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সর্বস্তরের মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। অথচ সরকার জনমতের কোনো তোয়াক্কাই করছে না। জনগণের এধরণের গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনেরই অংশ। আজ পুলিশ প্রশাসন সরকারের দলীয় আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মিছিল পরবর্তী সমাবেশ থেকে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব আনু মুহাম্মদ হামলায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের বিচার দাবি করেন এবং দেশের সচেতন জনসাধারণকে সুন্দরবন ধ্বংসসহ মহাজোট সরকারের জাতীয় স্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব মানবমুক্তির পথ দেখিয়েছিলো

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

যাদের শ্রমে সম্পদ তৈরী হয় পুঁজিবাদী সমাজে তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত, সমাজতন্ত্রে এরাই দেশের মালিক

আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের কথা ভাবুন। যে কৃষক আমাদের মুখের অন্ন জোগায়, তার মুখে আহার জোটে না। ফসল ফলিয়ে উৎপাদন খরচই তার ওঠে না। কারখানায় কাজ করে যে শ্রমিক বৈদেশিক মুদ্রা বয়ে আনে; সে ন্যায্য মজুরি পায় না। দাবি তুললে জোটে পুলিশের লাঠি-গুলি। কখনো ভবন ধ্বসে কিংবা কখনো আগুনে পুড়ে মরে। এই সেদিন ফয়েল পেপার তৈরির কারখানায় পুড়ে মরল ৩৫ জন শ্রমিক! সমাজতন্ত্র দেখিয়েছিল – সম্পদের স্রষ্টা যে, সম্পদ ভোগের অধিকারও তার। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক খাটে জীবিকার কাছে সে বাঁধা বলে। সমাজতন্ত্রে তার শ্রম সৃজনশীল, সে শুধু পেট চালানোর জন্য খাটে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তাই হয়েছিলো। লেনিন বিপ্লবের ছয় বছর পরেই মারা যান। তখন গৃহযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। গোটা রাশিয়া বিপর্যস্ত। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, গরম কাপড় নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত নেই অনেক মানুষের। সেই দেশকে অমিত শক্তিতে দাঁড় করিয়েছিলেন লেনিনের সুযোগ্য শিষ্য কমরেড স্ট্যালিন। তিনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। রাশিয়ার জনগণকে এই চেতনায় দাঁড় করালেন যে, গোটা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণী রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। রাশিয়ার জনগণের ব্যর্থতা সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা হিসেবেই পরিগণিত হবে, আর দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলন পিছিয়ে যাবে কয়েক যুগ। রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী তখন আনন্দচিত্তে দিন-রাত কর্মযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। পৃথিবীর সবচে' বড় ট্রাক্টর কারখানা, সবচে' বড় যন্ত্র তৈরীর কারখানা – কি করেনি সোভিয়েত শ্রমিকরা! পাঁচ বছরের পরিকল্পনা চার বছরে সমাপ্ত করেছিল। বিরাট বিরাট সমবায় ও যৌথ খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাজার হাজার স্কুল গড়ে উঠেছিল কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শুধু ইউক্রেনে দু'বছরে ৭ হাজার 'ল্যাবরেটরী কুটির' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। রাশিয়া ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়েছেন এ দেখে, এ শ্রমজীবি মানুষরাই প্রবল ঔৎসুক্যে রাত পর্যন্ত থিয়েটার দেখছে। বড় বড় লেখক-গায়ক-নাট্যকারের জন্ম হয়েছিলো সেদিন, জন্ম হয়েছিলো রুচিবান দর্শকের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের ভূমিকা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে লড়াকু মানুষকে প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছিল

বাজার দখলে উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় গোটা পৃথিবীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, প্রতিরোধ দুর্গ হয়ে তখন হিটলারের বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়েছিলো সোভিয়েত। সোভিয়েত ইউনিয়নের আড়াই কোটি মানুষ জীবন দিয়ে সেদিন হিটলারকে ঠেকিয়েছিলো। রোগশয্যায় শায়িত রবীন্দ্রনাথ সে সময় রেড আর্মির অগ্রযাত্রার খবর শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হতেন। বলেতেন, 'পারবে, ওরাই পারবে সভ্যতাকে রক্ষা করতে'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েতের প্রতিরোধ সংগ্রামের অগ্রযাত্রায় পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সমাজতন্ত্র। দেশে দেশে উপনিবেশ বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম গতি পেয়েছিল, উপনিবেশের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছিল বহুদেশ। সুয়েজখালের দখল নিতে তৎপর ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েতের এক হুংকারে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। পরাক্রমশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের অকুতোভয় লড়াইয়ের প্রেরণা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। আজ দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্মমতা চলছে। গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে রক্তের স্রোত বইছে, ছারখার করে দেয়া হয়েছে ইরাক-আফগানিস্তান-লিবিয়া-সিরিয়া-ইয়েমেন-ফিলিস্তিনকে। আজ যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকতো, আমেরিকাসহ সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নির্বিচার এই আগ্রাসন চালাতে পারতো না। দেশে দেশে মানুষ নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছে, কি ক্ষতি হয়ে গেলো, কতবড় ভুল ঘটে গেলো। গোটা মানবজাতিকে, তার মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এই বিরাট প্রতিরোধশক্তি আজ আর নেই। আজ পৃথিবী অভিভাবকহীন।

সোভিয়েতের বেদনাদায়ক পতনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের অকার্যকারিতা প্রমাণ হয় না

এতসব মহৎ কীর্তি স্থাপনকারী সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন হল কেন – স্বভাবতই প্রশ্ন আসে। সমাজতন্ত্র হলো পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের অন্তবর্তী ধাপ। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও জনগণের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবধারা দূর হয়ে যায় না। একদিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি মালিকানার অবসানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ, অন্যদিকে তীব্র আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের এক কঠিন ও কষ্টকর পথে তাকে অগ্রসর হতে হয়।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা পুঁজিপতি শ্রেণির নিরন্তর ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ যেমন ছিল, পাশাপাশি ছিল সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের নানা চক্রান্ত। অপরিসীম মূল্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ধাক্কা সামাল দিতে গিয়ে আদর্শগত চেতনার ক্ষেত্রে দুর্বলতা তৈরি হয়েছিলো। আর অন্তর্ঘাতমূলক নানা চক্রান্ত তো ছিলই। সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী ব্যক্তিস্বার্থের প্রবণতা ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিলো। আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে পরাস্ত করার যে সংগ্রাম চলছিলো তার মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ-ব্যক্তিবাদকে প্রসার ঘটাবার জন্য কিছু সুবিধা দেয়া ক্রুশ্চেভ আমল থেকে শুরু হলো। পুঁজিবাদী সমাজের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর ঝোঁকে ব্যক্তিগত ইনসেনটিভ দেয়া শুরু হলো। কালক্রমে ১৯৯২ সালে এসে গর্বাচেভের হাত ধরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটল। এ বিপর্যয় বাইরের শক্তি ঘটাতে পারেনি, অভ্যন্তরের শক্তিই ঘটিয়েছিল। কমরেড লেনিন ও কমরেড স্ট্যালিন এ বাপারে পূর্বেই হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কমরেড মাও সে তুং সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার সতর্ক করেছেন। তাদের দেখানো পথে চললে মানবজাতির এতবড় বিপর্যয় ঘটতো না। কিন্তু সোভিয়েত পার্টির শোধনবাদী নেতারা সে পথে চললেন না। এর ফলে সোভিয়েতের পতনের পর একে একে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোরও পতন ঘটল।

বহু জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়েই কোনো আদর্শ সমাজে স্থায়ী হয়

যে কোনো আদর্শ ও সমাজব্যবস্থার চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য দীর্ঘ সময় লাগে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপে সাড়ে ৩'শ বছর লড়াই হয়েছে। ধর্মীয় আদর্শগুলোকেও বহু জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র টিকে ছিল ৭০ বছর। পেছনের হাজার হাজার বছরের শোষণমূলক ব্যবস্থার ইতিহাস মুছে দেয়ার জন্য ৭০ বছর সময় খুবই সামান্য। আজ গৌরব ও অর্জনের শিক্ষা যেমন আছে, পতনের শিক্ষাও সামনে আছে। যথার্থভাবে এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে উঠবেই। কারণ পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কোনো পথ নেই। তাই বলে কেবল আকাঙ্খা দিয়ে এ লড়াই সঠিক পথ পাবে না। এজন্য চাই সঠিক বিপ্লবী দল।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র আজ প্রহসনের অন্য নাম

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনে একদিন যারা জয়োল্লাস করেছিলো, বলেছিল এর অবসানে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আসবে – আজ তারা মানবজাতির সামনে কিভাবে মুখ দেখাবে? পৃথিবীতে আপাত ভারসাম্য যেটুকু ছিল, তা নষ্ট হয়ে গোটা পৃথিবী আজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিষ নখরে রক্তাক্ত। বাজারের দখলের লড়াইয়ে সৃষ্ট দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত এখনো শুকায়নি। গোটা পৃথিবীর অর্থনীতির ওপর প্রভুত্ব করতে দেশে দেশে চলছে আগ্রাসন। মধ্যপ্রাচ্যে ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বিভাজন সৃষ্টি করে লুটে নিচ্ছে তেল-গ্যাস। ইরাক দখল করে হত্যা করেছে ১৫ লক্ষ মানুষ। লিবিয়াকে ধ্বংস করেছে। ফিলিস্তিন-সিরিয়ায় প্রতিদিনই রক্ত ঝরছে। জাতিগত দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত আফ্রিকা। কখনো যুদ্ধ, আবার কখনো শান্তির বাণী ফেরি করে এরা বিশ্বের দেশে দেশে চালাচ্ছে আগ্রাসন। যতই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ হোক না কেন পুঁজিবাদের উপসর্গগুলো আড়াল করতে পারেনি। গণতন্ত্রের ভেক নিয়ে জনমতকে এরা দমন করে নানা কায়দায়। খোদ আমেরিকায় এখন বর্ণ ও ধর্ম বিদ্বেষী প্রচার চলছে। নির্বাচনের নামে এরা এমন পরিস্থিতি এরা তৈরী করে, যাতে দুইভাগে বিভক্ত ধনকুবেরদের কোন এক প্রতিনিধিকে মানুষ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশেও গণতন্ত্রের ঠাঁটবাট আছে কিন্তু গণতন্ত্র নেই

বাংলাদেশেও যে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জয়গান করা হয়, তার চেহারা কি? কত কত নির্বাচন হল, জনগণের অধিকার পূরণ হল কি? নির্বাচনে জনমতের কোন প্রতিফলন ঘটে না। এখানে প্রথম ও শেষ কথা মানি ও মাসল পাওয়ার। তারপরও যতটুকু ঠাঁটবাট ছিল, আওয়ামী মহাজোট তারও ধার ধারেনি। ভোটবিহীন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় দফা ক্ষমতাসীন হয়ে চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। উন্নয়নের মুখরোচক শ্লোগান আউড়ে দুর্নীতি ও লুটপাটের ষোলকলা পূর্ণ করছে। জনমতের তোয়াক্কা না করে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়নের অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে অটল আছে। অতীতে ক্ষমতাসীন ও বর্তমান শাসকরা ভোটের স্বার্থে ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার এবং ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সাথে আপোষ-সমঝোতা করে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এমন পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, যার ফলে খুন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। বিচারহীনতার এমন এক সংস্কৃতি এরা তৈরি করেছে যে, এ থেকে অসহায়ত্ব ও উদ্বিগ্নতার পাকচক্রে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে লড়াইয়ের মনোভাব। গুম-খুন ও ক্রস ফায়ার চলছে সমানে। শিক্ষাসহ জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যুক্তিবাদ-বিজ্ঞানমনস্কতাকে মেরে দেয়া হচ্ছে। বৈষয়িক স্বার্থের রাজনীতির পঙ্কে নিমজ্জিত করে হরণ করা হচ্ছে তরুণদের প্রতিবাদের শক্তি। মাদক নেশার করাল গ্রাসে নিপতিত হচ্ছে যুবসমাজ। এভাবে নৈতিকতার চরম অবনমন ঘটিয়ে পুজিঁবাদী সমাজব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হয়ে আছে। কিন্তু এভাবেই কি চলবে?

সঠিক পথে লড়াই ভিন্ন মুক্তির পথ নেই

এভাবে চলতে পারে না। হতাশা কিংবা সংগ্রামবিমুখতা পুজিঁবাদের দুঃশাসনকে আরো দীর্ঘায়িত করবে। আবার যেকোন পথে লড়লেই মুক্তি আসবে না। এজন্যই বিপ্লবী দল প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর আজকের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী ধারণা - শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমরা বাসদ নামে দল গড়ে তুলেছিলাম। কিন্তু চলতে চলতে ঘোষিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেকেই আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেনি। বর্তমানে আমরা বাসদ (মার্কসবাদী) সে ধারা বহন করে চলেছি। আপনাদের কাছে আমাদের আহ্বান, আমাদের দলকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করুন। আপনাদের শক্তির ওপর ভর করে আমরা সর্বসাধ্য দিয়ে লড়তে চাই।

চট্টগ্রামে নারীমুক্তি কেন্দ্রের কমিটি গঠিত

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলার কাউন্সিল গত ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য মানস নন্দী ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এ কাউন্সিলে আসমা আক্তারকে আহবায়ক ও পূরবী চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্যের জেলা কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পপি চাকমা, ইন্দ্রানী ভট্টাচার্য, জান্নাতুল ফেরদাউস, জুলায়খা আক্তার জুলি ও তাজ নাহার রিপন।

চীনের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর নিয়ে কিছু কথা

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) থেকে অনেক বেশি। তবে এই ব্যাখ্যা থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা যাবে না যে বাংলাদেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী ভারতের প্রভাব কমে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চীনের প্রভাব বাড়ছে। কারণ এখনও ভারতের প্রভাবই বাংলাদেশের উপর বেশি। সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ব্যাপারে চীনের প্রস্তাবে এবারও বাংলাদেশ সাড়া দেয়নি। এটি ভারত-আমেরিকার চাপের কারণেই হচ্ছে না। ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখতে হবে যে, এই সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে খানিকটা ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করলো এবং এভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তার যে দর কষাকষির ক্ষমতা থাকে, তা প্রয়োগ করলো। আমাদের দেশে অনেক বামপন্থী দল আছেন যারা দেশকে একটি স্বাধীন দেশ ভাবেন না, সাম্রাজ্যবাদীদের তাবেদার রাষ্ট্র মনে করেন। আশা করি এ ঘটনায় তাদের চোখ খুলবে।

তবে এটাও দেখা উচিত যে, চীন এশিয়ার প্রধান শক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করতে চায় - তা ঠিক। কিন্তু তারা এখনও আমেরিকার মতো কোন আগ্রাসী শক্তি নয়। আমেরিকার অর্থনীতিটা পুরোপুরিই সামরিক অর্থনীতি। অস্ত্র উৎপাদনই তার মূল লক্ষ্য। তাই উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে অস্ত্র খালাস করার জন্য যুদ্ধ তার খুবই দরকার। চীনের ব্যাপারটা পুরোপুরি এমন নয়। ভবিষ্যতে কোন এক সময় এমন হতেও পারে, কিন্তু এখন নিজের ব্যবসার বৃদ্ধি, তাকে নিরাপদ রাখা ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই তার পদক্ষেপের মধ্যে আছে।

লেনিন

জে ভি স্ট্যালিন

ক্রেমলিন সামরিক বিদ্যালয়ের স্মৃতি সভায় প্রদত্ত ভাষণ, ২৮ শে জানুয়ারি, ১৯২৪

কমরেডস, আমাকে বলা হয়েছে এখানে আজ সন্ধ্যায় আপনারা লেনিন স্মৃতি সভার আয়োজন করেছেন এবং অন্যতম বক্তা হিসাবে আমি আমন্ত্রিত হয়েছি। আমি মনে করি না, লেনিনের কর্মকাণ্ডের উপর আমার তৈরী করা বক্তৃতা দেবার কোনও প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, মানুষ হিসাবে নেতা হিসাবে লেনিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি দিক তুলে ধরার মধ্যে যদি আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলেই ভাল হবে। হয়তো এই সব তথ্যের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত সম্পর্ক থাকবে না, কিন্তু লেনিন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। যাই হোক, যা বললাম, এই অনুষ্ঠানে তার বেশি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পার্বত্য ঈগল

লেনিনের সাথে আমি প্রথম পরিচিত হই ১৯০৩ সালে। এটা ঠিক, এই পরিচয় ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, ছিল চিঠি আদান-প্রদানের মাধ্যমে। কিন্তু তা আমার উপর এক অনপনেয় ছাপ ফেলেছিল, এমন ছাপ ফেলেছিল যা দলে আমার সমস্ত কাজের মধ্যেও মুছে যায়নি। তখন আমি সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। লেনিনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমার জ্ঞান সেই নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে এবং বিশেষ করে ১৯০১ সালের পর থেকে। ইসক্রা'র আবির্ভাবের পর আমি বুঝেছিলাম, লেনিনের মধ্যে আমরা এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ পেয়েছি। সেই সময় আমি তাঁকে শুধু দলের একজন নেতা মনে করতাম না। মনে করতাম, তিনিই দলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, তিনিই একমাত্র আমাদের দলের মর্মবস্তু ও জরুরী প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমি যখন দলের অন্যান্য নেতাদের সাথে তাঁর তুলনা করেছি, সব সময় আমার মনে হয়েছে তিনি তাঁর সহকর্মী – প্লেখানভ, মার্টভ, অক্সেলরড ও অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বড়। তাঁদের সাথে তুলনায় লেনিন নিছক নেতাদের একজন ছিলেন না, ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরের নেতা, এক পার্বত্য ঈগল, সংগ্রামে ভয় ছিল তাঁর অজানা এবং যিনি রুশ বিপ্লবের অনাবিষ্কৃত পথে নির্ভীকচিত্তে দলকে পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এমন গভীরভাবে এই ছাপ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়েছিল যে এ সম্পর্কে আমি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চিঠি না লিখে পারিনি। রাজনৈতিক নির্বাসনে এই বন্ধু বিদেশে ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানানোর জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। কিছুকাল পর, ১৯০৩ সালের শেষাশেষি, আমি তখন সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত, বন্ধুর কাছ থেকে একটা সোৎসাহ জবাব পেলাম এবং লেনিনের কাছ থেকে পেলাম একটা সরল আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি। বোঝা গেল, আমার বন্ধু লেনিনকে চিঠিটা দেখিয়েছিলেন। লেনিনের চিঠি ছিল তুলনামূলকভাবে ছোট। কিন্তু তাতে ছিল দলের ব্যবহারিক কাজের বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সমালোচনা। আর ছিল অদূর ভবিষ্যতে দলের সমস্ত কাজের খুব পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। অত্যন্ত জটিল বিষয়কে একমাত্র লেনিনই এই রকম সরল ও স্পষ্টভাবে লিখতে পারতেন। লিখতে পারতেন এমন সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠভাবে যে মনে হত প্রতিটি বাক্য শুধু কথাই বলছে না, রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসা গুলির মত কানে বাজছে। এই সরল ও বলিষ্ঠ চিঠি আমার এই প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করল যে লেনিনই হলেন আমাদের দলের পার্বত্য ঈগল। একজন পুরনো আত্মগোপনকারী কর্মীর অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে অন্যান্য চিঠির মত লেনিনের চিঠিও আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। এজন্য নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। সেই সময় থেকে লেনিনের সাথে আমার পরিচয়।

বিনয়

১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে ট্যামারফোর্সে (ফিনল্যান্ড) বলশেভিক সম্মেলনে লেনিনের সাথে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি দলের পার্বত্য ঈগলকে, একজন বিরাট ব্যক্তিকে দেখার আশা করেছিলাম। শুধু রাজনীতির দিক থেকেই বিরাট নন, যদি শুনতে চান, দেহের দিক থেকেও বিশাল – কারণ আমার কল্পনায় লেনিনকে আমি চিত্রিত করেছিলাম একজন মহিমান্বিত, কর্তৃত্বব্যঞ্জক, বিরাটাকায় পুরুষ হিসেবে। তারপর ভীষণ হতাশ হলাম যখন দেখলাম অত্যন্ত সাধারণ দেখতে একজন মানুষ, দৈর্ঘে গড় উচ্চতারও নীচে। যাঁকে কোনভাবেই, আক্ষরিক অর্থে কোনভাবেই সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করা যায় না...

এটাস্বাভাবিক বলে মনে করা হয়, একজন 'মহান ব্যক্তি' সভায় আসবেন দেরীতে। সভায় সমবেত সবাই তাঁর জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকবে। আর তারপর 'মহান ব্যক্তির' সভায় ঢোকার ঠিক আগে ফিস ফিস করে সাবধানবাণী উচ্চারিত হবে, "চুপ! আস্তে! উনি আসছেন!" আনুষ্ঠানিকতার এই বিষয়টা আমার অনাবশ্যক বলে মনে হয়নি। কারণ, এতে মনের উপর একটা ছাপ পড়ে, শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। খুব হতাশ হলাম, যখন জানলাম প্রতিনিধিরা আসার আগেই লেনিন সম্মেলনে হাজির হয়েছেন, কোন এক কোণায় বসে অনাড়ম্বরভাবে সম্মেলনের অতি সাধারণ প্রতিনিধিদের সাথে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। গোপন করব না, তখন আমার মনে হয়েছিল, এ যেন প্রয়োজনীয় নিয়ম লংঘনের সামিল।

কেবল পরবর্তীকালে আমি উপলব্ধি করেছিলাম, এই সারল্য ও বিনয়, সকলের অলক্ষ্যে থাকার চেষ্টা, বা অন্ততপক্ষে সবার নজরে না পড়ে নিজেকে এমন করে রাখা এবং নিজের উচ্চপদকে জোরের সাথে প্রকাশ না করা – জনগণের নতুন নেতা হিসাবে, মানব সমাজের 'সাধারণ স্তরের' মানুষের নেতা হিসাবে ছিল লেনিনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম।

যুক্তির শক্তি

এই সম্মেলনে লেনিন দুটো উল্লেখযোগ্য ভাষণ দিয়েছিলেন। একটা সমসাময়িক পরিস্থিতি ও অপরটা কৃষি-সমস্যার উপর। দুঃখের বিষয়, তা সংরক্ষিত হয়নি। এই প্রেরণাদায়ী ভাষণ দুটো সম্মেলনকে প্রচণ্ড উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রত্যয়ের অসাধারণ ক্ষমতা, যুক্তির সারল্য ও স্বচ্ছতা, সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য বাক্য, ভনিতা, হতবুদ্ধিকর অঙ্গভঙ্গি ও নাটকীয় বাক্যবিন্যাসের আশ্রয় না নেওয়া – গতানুগতিক 'সংসদীয়' বক্তাদের সাথে লেনিনের বক্তৃতার পার্থক্য ছিল এখানেই।

কিন্তু লেনিনের বক্তৃতার এই সব গুণাবলি তখন আমাকে আকৃষ্ট করেনি। আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর বক্তব্যের অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা। তাঁর বক্তৃতা ছিল বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু তা শ্রোতাদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রমশই তাদের মনে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছিল এবং তারপর বলা যায় তাদের একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল। মনে পড়ে অনেক প্রতিনিধি বলেছিলেন ঃ "লেনিনের যুক্তি শক্তিশালী বাহুপাশের মত। এ তোমায় আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলবে, ফাঁসের মত আঁকড়ে ধরবে। তুমি তার কব্জা থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারবে না। হয় তোমাকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে, না হয় চরম পরাজয় বরণ করতে হবে।" আমি মনে করি লেনিনের বক্তৃতার এই বৈশিষ্ট্য বাগ্মী হিসাবে তাঁর শিল্পকলার সবচেয়ে শক্তিশালী বিশেষত্ব।

নাকী কান্না নয়

লেনিনের সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয় ১৯০৬ সালে আমাদের দলের স্টকহোম কংগ্রেসে। আপনারা জানেন, এই কংগ্রেসে বলশেভিকরা সংখ্যালঘু ছিল এবং তাঁরা পরাজিত হয়েছিল। পরাজিতের ভূমিকায় এই প্রথম আমি লেনিনকে দেখলাম। কিন্তু তিনি মোটেই সেই ধরনের নেতা ছিলেন না, যিনি পরাজয়ে নাকী কান্না শুরু করবেন এবং হতাশ হয়ে পড়বেন। বরং পরাজয় লেনিনকে ঘনীভূত তেজের উৎসে পরিণত করল। এর ফলে তাঁর সমর্থকেরা নতুন সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ বিজয়ের জন্য উদ্দীপিত হল। আমি বলেছি, লেনিন পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা কি ধরনের পরাজয় ছিল? প্লেখানভ, অক্সেলরড, মার্টভ ও অন্যান্যরা – যাঁরা স্টকহোম কংগ্রেসে জয়ী হয়েছিলেন, তাঁর সেই বিরোধীদের দিকে আপনারা কেবল তাকিয়ে দেখুন। তাঁদের চোখেমুখে বিজয়ীর লক্ষণ প্রায় ছিল না বললেই চলে। কারণ বলতে কী, মেনশেভিকবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের ক্ষমাহীন সমালোচনা ওঁদের দেহের একটা হাড়ও আস্ত রাখেনি। মনে পড়ছে, আমরা বলশেভিক প্রতিনিধিরা, একসাথে জড়ো হয়ে তাকিয়ে ছিলাম লেনিনের দিকে, তাঁর উপদেশ চাইছিলাম। কোনও কোনও কমরেডের ভাষণে ফুটে উঠেছিল ক্লান্তি ও হতাশার সুর। মনে আছে, তিক্তভাবে দাঁতে দাঁত চেপে লেনিন এই সব ভাষণের জবাব দিয়েছিলেন, "নাকী কান্না কাঁদবেন না কমরেডস, আমরা জিতবই, কারণ আমরা সত্য পথে চলছি।" নাকী কাঁদুনে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ঘৃণা, নিজেদের শক্তির উপর আস্থা, জয়লাভে বিশ্বাস – আমাদের মনে লেনিন এগুলি গেঁথে দিয়েছিলেন। আমরা অনুভব করেছিলাম, বলশেভিকদের পরাজয় সাময়িক, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা জিতবেই জিতবে।

"পরাজয়ে নাকী কান্না নয়" – এই ছিল লেনিনের কাজের বৈশিষ্ট্য। এর ফলে নিজের শক্তিতে আস্থাবান ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত একটা বাহিনী তাঁর চারদিকে সমবেত হতে পেরেছিল।

দম্ভ নয়

লন্ডনে ১৯০৭ সালে, পরবর্তী কংগ্রেসে বলশেভিকরা বিজয়ী হয়েছিল। বিজয়ীর ভূমিকায় এই প্রথম আমি লেনিনকে দেখলাম। জয় কোনও কোনও নেতার মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তাদের উদ্ধত ও দাম্ভিক করে তোলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা জয়োল্লাসে মেতে থাকে, অর্জিত বিজয় সম্মান নিয়ে বিশ্রাম করতে শুরু করে। কিন্তু এই ধরনের নেতাদের সাথে লেনিনের একটুও মিল ছিল না। বরং জয়লাভের ঠিক পরই তিনি বিশেষ সতর্ক ও সাবধানী হয়ে উঠতেন। আমার মনে পড়ছে, দৃঢ়তার সাথে লেনিন প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঃ প্রথম বিষয় হল জয়ের ফলে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন না, অহংকারী হবেন না; দ্বিতীয় বিষয় হল বিজয়কে সংহত করুন; তৃতীয় বিষয় হল শত্রুকে শেষ আঘাত হানুন, কারণ সে পরাজিত হয়েছে – ধ্বংস হয়নি। যে সব প্রতিনিধিরা জোর গলায় বলছিল, " মেনশেভিকরা এখন শেষ হয়ে গেছে" তাদের তীব্র ভাষায় তিনি ভর্ৎসনা করেছিলেন। তিনি সহজেই দেখিয়েছিলেন, শ্রমিক আন্দোলনে এখনও মেনশেভিকদের প্রভাব আছে, দক্ষতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে দেখা ও বিশেষভাবে শত্রুর শক্তি কমিয়ে দেখা চলবে না।

"জয়লাভে দম্ভ নয়" – এই ছিল লেনিনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর ফলে স্থির চিত্তে তিনি শত্রুর শক্তি মূল্যায়ন করতে পারতেন এবং সম্ভাব্য বিপদ থেকে দলকে রক্ষা করতে পারতেন।

নীতির প্রতি বিশ্বস্ততা

দলের নেতারা দলের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতের মূল্য না দিয়ে পারেন না। সংখ্যা গরিষ্ঠতার শক্তিকে কোন নেতা না মেনে পারেন না। দলের অন্য নেতাদের তুলনায় লেনিন এটা কম বুঝতেন না। কিন্তু লেনিন কখনই সংখ্যা গরিষ্ঠের হাতে বন্দী ছিলেন না, বিশেষ করে যখনই সেই সংখ্যা গরিষ্ঠের কোন নীতির ভিত্তি থাকতো না। আমাদের দলের ইতিহাসে এমন অনেক সময় গিয়েছে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বা দলের সাময়িক স্বার্থ ও সর্বহারার মৌলিক স্বার্থের মধ্যে সংঘাত ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে গিয়ে নীতির পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে লেনিন কখনও দ্বিধা করেননি। সর্বোপরি আক্ষরিক অর্থে, এসব ক্ষেত্রে সবার বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতেও তিনি ভয় পাননি। তিনি মনে করতেন, প্রায়ই বলতেন, "যে নীতি দাঁড়িয়ে আছে আদর্শের উপর, তাই একমাত্র সঠিক নীতি।"

নিম্নলিখিত দুটো ঘটনা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম ঘটনা। ১৯০৯-১১ সালের কথা। তখন প্রতিবিপ্লবের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ দলে ভাঙনের প্রক্রিয়া চলছিল। দল ছিল অবিশ্বাসের যুগে। পাইকারী হারে দলত্যাগ চলছিল। শুধু বুদ্ধিজীবীরাই দলত্যাগ করছিল তা নয়, এমনকী শ্রমিকদের একটা অংশও দলত্যাগ করছিল। সময়টা ছিল দলের অবলুপ্তি ও বিপর্যয়ের সময়, তখন বে-আইনী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকার করা হচ্ছিল না। কেবল মেনশেভিকরাই নয়, বলশেভিকরাও নানা উপদল ও ধারায় বিভক্ত ছিল। কারণ, অধিকাংশই শ্রমিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। আপনারা জানেন, সেই সময় বে-আইনী সংগঠনকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলার ও শ্রমিকদের বৈধ উদার স্টপিলিন পার্টিতে সংগঠিত করার যে ধারণা তার উদ্ভব হয়েছিল। দলের আদর্শকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পার্টির শক্তিকে একত্র করেছিলেন। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে সমস্ত পার্টি বিরোধী প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, অতুলনীয় সাহস ও অধ্যাবসায়ের সাথে তিনি পার্টির আদর্শকে রক্ষা করেছিলেন।

আমরা জানি, দলের আদর্শ রক্ষার এই সংগ্রামে লেনিন পরবর্তীকালে বিজয়ী প্রমাণিত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা। তখন ছিল ১৯১৪-১৭ সালের সময়পর্ব। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ তখন চলছে জোর কদমে। তখন প্রায় বা সব কটা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ও সোস্যালিস্ট পার্টি সার্বজনীন দেশপ্রেমের উন্মাদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এ হচ্ছে সেই সময় যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তার পতাকা পুঁজিবাদের কাছে সমর্পণ করেছিল, তখন এমনকী প্লেখানভ, কাউটস্কি, ও অন্যান্যরা উগ্র জাতীয়তাবাদের জোয়ারকে প্রতিরোধ করতে পারেননি। সে সময়, লেনিনই ছিলেন একমাত্র বা প্রায় একমাত্র ব্যক্তি যিনি উগ্র জাতীয়তাবাদ ও শান্তিবাদিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, গেজদে ও কাউটস্কির বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা করেছিলেন, না-ঘর কা না-ঘাটকা 'বিপ্লবীদের' দোদুল্যমানতাকে কলংক চিহ্নিত করেছিলেন। লেনিন জানতেন, তাঁর পিছনে রয়েছে কেবল একটা নগণ্য সংখ্যালঘু, কিন্তু তাঁর কাছে এটা চূড়ান্ত মুহূর্ত ছিল না। কারণ তিনি জানতেন নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিই হল সঠিক নীতি যার ভবিষ্যত আছে। তিনি জানতেন আদর্শভিত্তিক কর্মপন্থাই সঠিক কর্মপন্থা। আমরা জানি, একটা নতুন আন্তর্জাতিকের জন্য এই সংগ্রামেও লেনিন বিজয়ী বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন। (৬পৃষ্ঠায় দেখুন)

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ঢাকা-কুড়িগ্রাম রোডমার্চ

উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বন্যা পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে এই সর্বনাশা বাঁধ খুলে দেয়ার কারণে। এবার ভারত সরকার তাদের দেশের পুঁজিপতিদের স্বার্থে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের নামে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পানির যোগানদাতা ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করছে। এই পরিকল্পনা যদি তারা সম্পন্ন করতে পারে তবে তা আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে। উত্তরবঙ্গ ক্রমাগত মরুকরণের দিকে যাবে। আমাদের কৃষিজমি-প্রকৃতি-প্রাণ ধ্বংস হয়ে যাবে। বন্ধুত্বের কথা বলে ভারত অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট, রামপালে বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্ত ক্ষেত্রগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। অথচ পানিসম্পদের ন্যায্য অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে সরকার ন্যূনতম দায়িত্ববোধেরও পরিচয় দিতে পারেনি। যেখানে খোদ ভারতেরই বড় বড় পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞরা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করছে অথচ বাংলাদেশের সরকার নীরব ও নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে মহাজোট সরকার ভারতের সাথে যুক্তিসঙ্গত পানি বন্টন নীতিমালার ভিত্তিতে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারছে না। তাই দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হলে এই সর্বনাশা পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ম. ইনামুল হক বলেন, 'ভারত যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষের স্বার্থবিরোধী। একইসাথে এটি ভারতেরও ৯৯ শতাংশ মানুষের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে। নদীকে এভাবে শাসন করলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কেননা প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেয়।'

শেখ রোকন বলেন, 'নদী নিয়ে ভারতের আগ্রাসী নীতি এবং বাংলাদেশ সরকারের অবহেলার প্রতিবাদে যে আন্দোলন এই রোডমার্চের মধ্য দিয়ে শুরু হলো তা আগামী দিনে রাজনীতির নতুন মেরুকরণ ঘটাতে পারে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ভারত সরকার কেবল পরিকল্পনাই করেনি, তা সম্পাদনের প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে। এই প্রকল্প যদি বাস্তবায়িত হয় তবে তা বাংলাদেশের জন্য ডেকে আনবে ভয়াবহ পরিণতি। সময় থাকতেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে। এই আন্দোলন হলো সর্বব্যাপক, তাই দেশপ্রেমিক-প্রগতিশীল সকল মানুষ ও সংগঠনকে এই লড়াইয়ে শামিল হতে হবে।'

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নিয়ে রাজধানীর কলাবাগান পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা থাকলেও প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে হাইকোর্টের সামনে কদম ফোয়ারার এসে শেষ হয়। এরপর রোডমার্চের নেতা-কর্মীরা বাসযোগে যাত্রা শুরু করেন। পরে বিকেলে বগুড়ার শেরপুরে পথ সভা শেষ করে বগুড়ার সাতমাথায় সমাবেশে মিলিত হয়। জেলা সমন্বয়ক শামসুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে ও সদস্য রঞ্জন দে-র পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, আ.ক.ম জহিরুল ইসলাম, সাইফুজ্জামান সাকন।

পরদিন সকাল ১০টায় রোডমার্চ গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। পথে মহাস্থানগড়, মোকামতলা, গোবিন্দগঞ্জ ও পলাশবাড়িতে পথসভা শেষে সন্ধ্যায় গাইবান্ধা পৌর শহীদমিনার চত্বরে বিকেল ৫টায় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মানস নন্দী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, মনজুর আলম মিঠু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা প্রমুখ।

গাইবান্ধায় রাত্রিযাপন শেষে পরদিন সকালে আবার রোডমার্চ যাত্রা শুরু করে। দাড়িয়াপুর, ধর্মপুর, শোভাগঞ্জ ও সুন্দরগঞ্জে পথসভা করে রংপুর পায়রা চত্বরে বিকেল ৫টায় জনসভায় মিলিত হয়। এখানে দলের জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তৃতা করেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মানস নন্দী, ওবায়দুল্লাহ মুসা, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, আ.ক.ম জহিরুল ইসলাম, আহসানুল হাবীব সাঈদ প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন দলের রংপুর জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ।

৫ অক্টোবর রোডমার্চের সমাপনী দিন। এদিন সকাল ১০টায় রোডমার্চ তার গন্তব্যস্থল কুড়িগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। সাতমাথা, কাউনিয়া, তিস্তা, সিংগের ডাবরি ও রাজারহাটে পথসভা শেষ করে রোডমার্চ কুড়িগ্রাম শহরে প্রবেশ করে। শহরের কলেজ মোড় থেকে শুরু করে শহীদ মিনার হয়ে জিয়া বাজার, দাদামোড় ঘুরে পুনরায় শহীদ মিনার এসে বিকাল সাড়ে ৪টায় সমাপনী সমাবেশে মিলিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নেতা মহিরউদ্দিন মহিরের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মানস নন্দী, সাইফুজ্জামান সাকন, গাইবান্ধা জেলা শাখার সমন্বয়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা। সমাবেশ পরিচালনা করেন কুড়িগ্রাম জেলা শাখার নেতা আব্দুর রাজ্জাক।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এদেশের মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী তাদের সেই দায়িত্বে অবহেলা করে আসছে। বর্তমান

রোডমার্চকে স্বাগত জানাচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলা শাখা

রোডমার্চে সমাপনী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী

সরকার ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে জিগির তুলছে অথচ এদেশের প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসকারী ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করছে না। বরং সাম্রাজ্যবাদী ভারত রাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় থাকার জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিচ্ছে। তাই দেশের স্বার্থ এবং মানুষকে রক্ষার জন্য জনগণেরই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। উল্লেখ্য, রোডমার্চটি গত ২ অক্টোবর ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করে দীর্ঘ ৩৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ৫ অক্টোবর কুড়িগ্রামে এসে সমাপ্ত হয়। রোডমার্চে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গাইবান্ধা জেলার একটি গানের দল আন্তঃনদী সংযোগ নিয়ে রচিত গান পরিবেশন করে পথে পথে উপস্থিত জনতাকে উদ্দীপ্ত করে।

রোডমার্চের সমাপনী সমাবেশ

হতদরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা কেজির চাল বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি বাসদ (মার্কসবাদী) এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রংপুর : রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ অক্টোবর স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টি জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু, রোকনুজ্জামান রোকন।

নোয়াখালী : সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ অক্টোবর রোববার সকাল ১২টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে ক্ষেতমজুর ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট জেলা কমিটির আহবায়ক তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনজুর আলম মিঠু, বাসদ(মার্কসবাদী) জেলা কমিটির আহবায়ক দলিলের রহমান দুলাল, নবগ্রাম অঞ্চলের কৃষক প্রতিনিধি আবুল হাসেম, চরকলমীর কৃষক প্রতিনিধি আরশাদ আলী প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন বিটুল তালুকদার।

খাদিজার উপর বর্বর হামলা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে এ সমাজে নারীর স্থান কোথায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এর ভাইস প্রিন্সিপাল ফজলে রহমান চৌধুরী ফারহান, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলার সদস্য লক্ষী পাল, খাদিজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী এষা, তানজিনা প্রমুখ।

এমসি কলেজে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

খাদিজা আক্তার নার্গিসের উপর এম.সি কলেজ ক্যাম্পাসে বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এম.সি কলেজ শাখার উদ্যোগে দুপুর ১২টায় মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে গোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বাংলা বিভাগের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। এম.সি কলেজ শাখার সংগঠক সাদিয়া নোশিন তাসনিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সহ-সভাপতি সঞ্জয় কান্ত দাস, সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদ, রুবেল মিয়া, পিংকি চন্দ প্রমুখ।

এই ঘটনার প্রতিবাদে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোক ও জনগণকে যুক্ত করে এই দুই সংগঠনের স্বতন্ত্র উদ্যোগে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

ইন্টারনেটে পর্নো ওয়েবসাইট ও পর্নো পত্রিকা-সিডি-বই বিক্রি নিষিদ্ধকরণ, মাদক-জুয়া রোধসহ বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র-এর কেন্দ্রঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯ অক্টোবর ঢাকায় তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে এবং সারাদেশে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ইন্টারনেটে পর্নো ওয়েবসাইট বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পর্নো পত্রিকা সিডি-বই বিক্রি বন্ধের দাবি

গাইবান্ধা: বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুন, সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, সহ-সভাপতি সুভাসিনী দেবী, জাহেদা বেগম মিনা, হালিমা খাতুন, শামীম আরা মিনা প্রমুখ।

রংপুর: কাচারী বাজার চত্বরে জেলা সংগঠক কামরুন্নাহার খানম শিখার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা পলাশ কান্তি নাগ, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু, নন্দিনী দাস, শাপলা রায়, চন্দনা রায়, লিপি রায়।

সিলেট: সিলেট জেলার সদস্য লক্ষী পালের নেতৃত্বে আমিনা বেগম, শেলী দাস, কেয়া সরকার, সাদিয়া নোশিন তাসনিমসহ সদস্যবৃন্দ জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

দিনাজপুর: দিনাজপুর জেলার সংগঠক রাহানুমা আক্তার রাখির নেতৃত্বে সাথী খালক, শামীমা আক্তার, ইতি বিশ্বাস, অনিতাসহ সদস্যবৃন্দ জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

চট্টগ্রাম: জেলা কমিটির সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস পপি, তাজ নাহার রিপন ও মাহাফুজা খাতুন মলির নেতৃত্বে অন্যান্য সদস্যবৃন্দ জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

নোয়াখালী: জেলার সদস্য স্বর্ণালী আচার্য্যের নেতৃত্বে মুনতাহার প্রীতি, লিনা, মিমসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

রামপাল চুক্তি বাতিলের দাবিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকেল র‍্যালি

গত ২১ অক্টোবর বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুন্দরবন বিনাশী রামপাল চুক্তি বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদী সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। বিজয় '৭১-এর পাদদেশে অনুষ্ঠিত সাইকেল র‍্যালির উদ্বোধন ঘোষণা করেন তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, "সুন্দরবন ধ্বংস হলে বাংলাদেশ ধ্বংস হবে। আমরা আরও অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করতে পারবো, কিন্তু চাইলেও আরেকটি সুন্দরবন তৈরি করতে পারবো না"। ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখার সভাপতি রাফিকুজ্জামান ফরিদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক গৌতম করের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী শেখ ফরিদ। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাসদ(মার্কসবাদী) ময়মনসিংহ জেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড শেখর রায় এবং গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা আবুল হাসান রুবেল এবং প্রমুখ। এরপর সাইকেল র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় '৭১ থেকে শুরু হয়ে ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বিজয় '৭১-এ এসে শেষ হয়।

আন্দোলন করে কিছু হয়না'- এই তত্ত্বের অনুসারিরা কি বলবেন?

ভর্তি ফরমের মূল্যবৃদ্ধি রুখে দিল শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

প্রতিবছর ভর্তি ফরমের মূল্যবৃদ্ধি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণের ছোবলে এমনিতেই ছিন্নভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ছাত্রদের বেতন-সেমিস্টার ফি ইত্যাদি দফায় দফায় বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু যে ছাত্ররা এখনও ভর্তি হয়নি, পরীক্ষা দেবে মাত্র তাদের ফরমের মূল্যও অস্বাভাবিক হারে প্রতি বছর বাড়ানো হয়। ভর্তি পরীক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে, তার উপর ফরম পূরণ এখন অন লাইন ও মোবাইল নির্ভর। ফলে তারা সংগঠিত হয়ে প্রতিবাদ জানাতেও পারেনা। অসহায়ভাবে পরিস্থিতি মেনে নিতে হয়। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোই একমাত্র ক্যাম্পাসগুলোতে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ভিন্ন ঘটনা ঘটলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ফর্মের মূল্য ৭৫০-৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০০-১২০০ টাকা করা হয়। ২ অক্টোবর প্রশাসনের পক্ষ থেকে মূল্য ঘোষণার পর বামপন্থী ছাত্রসংগঠনগুলোর জোট 'প্রগতিশীল ছাত্রজোট' বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল ও সমাবেশ করে এবং উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে। পরবর্তীতে ফর্মের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠন এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'ভর্তি ফর্মের বর্ধিত মূল্য বিরোধী শিক্ষার্থী মঞ্চ'। দলে দলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এতে যোগ দেয়।

১৬ অক্টোবর থেকে মঞ্চের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয় এবং প্রশাসনকে আল্টিমেটাম দেয়া হয়। পরবর্তীতে ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে ১৯ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বিশেষ সভা আহ্বান করে। সভায় শিক্ষার্থীদের দাবি প্রশাসন মেনে নেয় এবং ফর্মের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করে ৮০০-৯০০ টাকা। যে ছাত্ররা আন্দোলন করে বিজয়ী হলো তারা ভুক্তভোগী নয়। কিন্তু বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্পৃহা থেকেই তারা টানা লড়তে পেরেছে। বলা বাহুল্য বাম ছাত্র সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে লেগে থেকে ছাত্রদের মনে এই জমি তৈরি করেছে।

কমরেড কৃষ্ণ কমলের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

বাসদ (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার সাবেক সমন্বয়ক কমরেড কৃষ্ণ কমলের ২য় মৃত্যু বার্ষিকীতে বগুড়ার সাতমাথায় স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জেলা সমন্বয়ক শামসুল হক দুলুর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শ্যামল ভট্টাচার্য, পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ওবায়েদুলাহ মুসা। সভা পরিচালনা করেন পার্টির সংগঠক রঞ্জন দে।

বক্তারা বলেন, কমরেড কৃষ্ণ কমল আমৃত্যু শোষিত-মেহনতি মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ধারণ করে মানবমুক্তির সংগ্রামে যুক্ত থাকার মধ্য দিয়েই কমরেড কৃষ্ণ কমল বড় চরিত্রের মানুষ হয়েছেন। আজ আমরা যদি কমরেড কৃষ্ণ কমলের প্রতি সত্যিকার অর্থে শ্রদ্ধা জানাতে চাই তাহলে তাঁর অপূরিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমাদের ব্রতী হতে হবে। বক্তারা কমরেড কৃষ্ণ কমলের সংগ্রামী জীবনের চেতনাকে ধারণ করে শোষণ মুক্তির সংগ্রাম জোরদার করার আহবান জানান।

রংপুরের পীরগাছা উপজেলা ডাকুয়ার দীঘি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১ অক্টোবর'১৬ শুক্রবার বিকেল ৫ টায় বাসদ (মার্কসবাদী) পীরগাছা উপজেলা শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের উপজেলা সংগঠক রঞ্জন বর্মন। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড ওবায়েদুলাহ মুসা। এছাড়াও আলোচনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু, কমরেড কৃষ্ণ কমলের মেজদাদা শিক্ষক পীযুষ কান্তি বর্মন, শিক্ষক তাপস চন্দ্র সাহা, বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ, ছাত্র ফ্রন্ট জেলা কমিটির পাঠাগার সম্পাদক আবু রায়হান বকসী। স্মরণ সভা পরিচালনা করেন লিপি রায়।

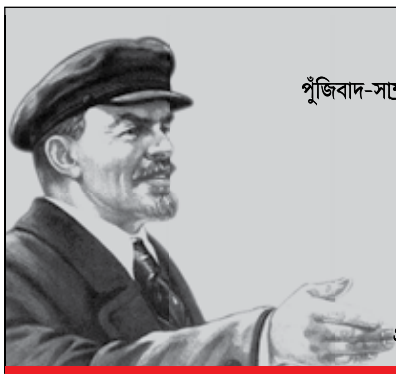

দুনিয়ার মজদুর এক হও!

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদী শাসন ও মৌলবাদ রুখে দাঁড়ান

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ সূচনা ও পার্টির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে

আলোচনা সভা ও র‍্যালি

৭ নভেম্বর ২০১৬, বিকাল ৩টা

কাজী বশির মিলনায়তন (মহানগর নাট্যমঞ্চ), গুলিস্তান, ঢাকা

সভাপতি ও প্রধান বক্তা
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)

বক্তা
কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী
সদস্য, বাসদ (মার্কসবাদী), কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল
সদস্য, বাসদ (মার্কসবাদী), কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

লেনিন

(৩য় পৃষ্ঠার পর) 'আদর্শভিত্তিক কর্মপন্থাই সঠিক কর্মপন্থা' – এই নীতির দ্বারা আক্রমণের মাধ্যমে লেনিন নতুন 'দুর্ভেদ্য' অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং বিপ্লবী মার্কসবাদের পক্ষে সর্বহারার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিয়ে এসেছিলেন।

জনগণের প্রতি বিশ্বাস

যাঁরা জাতির ইতিহাসের সাথে পরিচিত, যাঁরা বিপ্লবের ইতিহাস আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছেন, দলের সেইসব তাত্ত্বিক নেতারা অনেক সময় একটা লজ্জাজনক রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগ হল জনগণকে ভয়, জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতায় অবিশ্বাস। এর ফলে নেতাদের মধ্যে কোন কোন সময় এক ধরনের অভিজাতসুলভ মানসিকতার জন্ম হয়। এই জনগণ বিপ্লবের ইতিহাস বিশারদ নয়, তবু পুরনো ব্যবস্থা ধ্বংস ও নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদেরই। এই ধরনের অভিজাতসুলভ মানসিকতার সৃষ্টি হয় এই ভয় থেকে যে বিষয়গুলো শিথিল হয়ে যেতে পারে, জনগণ 'বড় বেশি ধ্বংস' করে ফেলতে পারে। জনগণকে কেতাবী শিক্ষার দ্বারা শেখানোর চেষ্টায় এক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালনের ইচ্ছা থেকেই এর জন্ম।

লেনিন ছিলেন এই ধরনের নেতাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। লেনিনের মত আর কোন বিপ্লবীর কথা আমার জানা নেই যাঁর সর্বহারা সৃজনী ক্ষমতা ও তাদের শ্রেণী প্রবৃত্তির কার্যকারিতার উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা ছিল। আমি আর কোন বিপ্লবীকে জানি না যিনি লেনিনের মত এত নির্দয়ভাবে 'বিপ্লবী বিশৃঙ্খলা' 'জনগণের অনুমোদনহীন উশৃঙ্খল কার্যকলাপের' কল্পনাশক্তিহীন ও সংকীর্ণচিত্ত সমালোচকদের চাবুক মারতে পারতেন। মনে আছে, আলাপ আলোচনা চলার সময় একবার একজন কমরেড বলেছিলেন, "বিপ্লবের পর স্বাভাবিক অবস্থা থাকা দরকার।" শ্লেষভরে লেনিন বলেছিলেন, "এটাই দুঃখজনক, যারা বিপ্লবী হতে চান তারা ভুলে যান, ইতিহাসের সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যবস্থা হল বিপ্লবী ব্যবস্থা।"

এই জন্য, লেনিন সেইসব লোকদের ঘৃণা করতেন, যারা জনগণকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখেন এবং জনগণকে কেতাবী জ্ঞান দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এইজন্য সবসময় লেনিন বলতেন ঃ জনগণ থেকে শিক্ষা নাও, তাদের কার্যকলাপ বোঝার চেষ্টা কর, জনগণের সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা সযত্নে অধ্যয়ন কর।

জনগণের সৃজনশীল ক্ষমতায় বিশ্বাস – এই ছিল লেনিনের কাজের বৈশিষ্ট্য। এর ফলে স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা বুঝতে এবং তার গতিকে সর্বহারা বিপ্লবের খাতে তিনি প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন।

বিপ্লবী প্রতিভা

লেনিন জন্মেছিলেন বিপ্লবের জন্য। সত্যই তিনি ছিলেন বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মহত্তম প্রতিভা, বিপ্লবী নেতৃত্বের সর্বোত্তম শিল্পী। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময়ই তিনি সবচেয়ে খুশী হতেন, সবচেয়ে স্বচ্ছন্দবোধ করতেন। এর দ্বারা অবশ্য আমি বলতে চাইছি না, সমস্ত বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে লেনিন সমানভাবে অনুমোদন করতেন বা সবসময় সব পরিস্থিতিতে তিনি বিপ্লবী অভ্যুত্থানের পক্ষে ছিলেন। একেবারেই তা নয়। যা আমি বলতে চাইছি তা হল, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় যেমন, তেমন আর কখনও লেনিনের প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি এত পুরোপুরি এত স্পষ্টভাবে দেখা যেত না। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় আক্ষরিক অর্থে তিনি প্রস্ফুটিত হতেন, পরিণত হতেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টায়, বিপ্লবের সম্ভাব্য আঁকাবাঁকা পথ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, এমনভাবে দেখতেন যেন এসব জিনিস তাঁর হাতের মুঠোয়। সঠিক ভাবেই আমাদের দলে প্রায়ই বলা হত, "জলে মাছের মত বিপ্লবের জোয়ারে লেনিন সাঁতার কাটতেন।"

এখানেই রয়েছে লেনিনের রণকৌশলগত স্লোগানের 'আশ্চর্য' স্বচ্ছতা ও তাঁর বিপ্লবী পরিকল্পনার 'শ্বাসরোধকারী' সাহসিকতা। লেনিনের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দুটো ঘটনা আমি মনে করিয়ে দেব।

প্রথম ঘটনা। তখন ছিল অক্টোবর বিপ্লবের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে ও পশ্চাদ্ভাগে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক সংকটের ফলে বাধ্য হয়ে শান্তি ও স্বাধীনতা দাবি করছিল। সেনাপতিরা ও বুর্জোয়ারা 'শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে' তখন সামরিক একনায়কত্বের জন্য কাজ করছিল। তখন তথাকথিত সমস্ত 'সমাজতান্ত্রিক দল' ও তথাকথিত 'জনমত' বলশেভিকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং তাদের 'জার্মানীর চর' হিসাবে চিহ্নিত করছিল। কেরেনস্কি তখন বলশেভিকদের আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করার চেষ্টা করছিল – ইতিমধ্যে খানিকটা সফলও হয়েছিল। তখনো পর্যন্ত শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অস্ট্রো-জার্মান কোয়ালিশন সরকারের সেনাবাহিনী আমাদের রণক্লান্ত, বিধ্বস্ত সেনাবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। তখনও পশ্চিম ইউরোপের 'সমাজতন্ত্রীরা' 'সম্পূর্ণ জয়লাভের জন্য যুদ্ধের' খাতিরে তাদের সরকারের সাথে পরম সুখের মৈত্রীতে বাস করছিল।

এইরকম একটা সময়ে অভ্যুত্থান শুরু করার অর্থ কি হত? এ রকম একটা পরিস্থিতিতে অভ্যুত্থান শুরু করলে সব কিছুর বিনিময়ে তা করতে হত। কিন্তু লেনিন ঝুঁকি নিতে ভয় পাননি। কারণ তিনি জানতেন, ভবিষ্যৎদ্রষ্টার চোখ দিয়ে তিনি দেখেছিলেন, অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং তা জয়যুক্ত হবেই। দেখেছিলেন, রাশিয়ার একটা অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ খতম করার পথ প্রস্তুত করে দেবে, দেখেছিলেন পশ্চিমের রণক্লান্ত ব্যাপক জনতাকে তা উদ্বুদ্ধ করবে, এই অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করবে। তা সোভিয়েতসমূহের এক প্রজাতন্ত্রের অগ্রদূত হবে, এবং এই সোভিয়েতের প্রজাতন্ত্র দুনিয়াব্যাপী বিপ্লবী আন্দোলনের দূর্গের কাজ করবে।

আমরা জানি, লেনিনের বিপ্লবী দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। এই সঠিকতার কোনও তুলনা ছিল না।

দ্বিতীয় ঘটনা। অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোর কথা। তখন গণ-কমিশার পরিষদ শত্রুতামূলক কাজকর্মের অবসানের জন্য এবং জার্মানীর সাথে যুদ্ধ বিরতির উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করার জন্য বিদ্রোহী সেনাপতি জেনারেল দুখোনিনকে বাধ্য করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। মনে পড়ছে, লেনিন, ক্রিলেংকো (ভবিষ্যৎ প্রধান সেনাপতি) ও আমি সরাসারি তারযোগে দুখোনিনের সাথে আলোচনার জন্য পেট্রোগ্রাডে জেনারেল স্টাফের সদর দপ্তরে গেলাম। সেটা ছিল এক ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। দুখোনিন ও রণাঙ্গনের সদর দপ্তর গণ-কমিশার পরিষদের আদেশ মানতে সরাসরি অস্বীকার করল। সেনাবাহিনীর অফিসারেরা ছিল একেবারে সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে। সাধারণ সৈনিকদের কথা বলতে গেলে, কেউ জানে না এই এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সেনা কী করবে। কারণ তারা ছিল তথাকথিত সেনাবাহিনীর সংগঠনগুলোর অধীন আর এই সংগঠনগুলো ছিল সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আমরা জানতাম, এক পেট্রোগাডেই সামরিক ক্যাডেটদের বিদ্রোহ দানা বাঁধছিল। এ ছাড়াও, কেরেনেস্কি অগ্রসর হচ্ছিলেন পেট্রোগাডের দিকে। মনে আছে, তার কেন্দ্রে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর লেনিনের মুখমণ্ডল সহসা অসাধারণ আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পরিষ্কার বুঝলাম, তিনি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। তিনি বললেন, 'চলুন আমরা ওয়্যারলেস স্টেশন যাই, এটা আমাদের খুব কাজে আসবে।' আমরা জেনারেল দুখোনিনকে বরখাস্ত করে তার জায়গায় ক্রিলেংকোকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করে এক বিশেষ আদেশ জারী করব এবং অফিসারদের ডিঙিয়ে সাধারণ সেনাদের আবেদন করব, আহ্বান জানাব তাদের সেনাপতিদের ঘেরাও করতে, শত্রুতামূলক কাজ বন্ধ করতে, অস্ট্রো-জার্মান সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং শান্তির দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে।

এটা ছিল অন্ধকারে ঝাঁপ। কিন্তু এই ঝাঁপ দিতে লেনিন ভয় পাননি। বরং, তিনি এই কাজ করলেন আগ্রহের সাথে। কারণ, তিনি জানতেন, সেনাবাহিনী শান্তি চায় এবং পথের সমস্ত বাধা ঝেঁটিয়ে দূর করে তারা শান্তি জয় করে আনবে। তিনি জানতেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতি অস্ট্রো-জার্মান সেনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবেই এবং সমস্ত ফ্রন্টেই শান্তির আকুল আকাঙ্খার সৃষ্টি হবে। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না।

আমরা জানি, এখানেও, লেনিনের বিপ্লবী দূরদৃষ্টি পরবর্তীকালে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।

প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি, আসন্ন ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত অর্থ দ্রুত বুঝতে পারা ও তার ভবিষ্যৎ কী হবে তা অনুধাবন করার দক্ষতা, লেনিনের এই সব গুণের ফলে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সন্ধিক্ষণে সঠিক রণনীতি ও স্বচ্ছ রণকৌশল রচনা করতে পারতেন।

চীনের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর নিয়ে কিছু কথা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এসব কোন বিষয়ই এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, "এই ঋণ আর কিছুই নয়, বাতাস মাত্র। এর কতটুকু বাংলাদেশ কঠিন করতে পারে তাই দেখার বিষয়।" তার এই কথার পক্ষে যুক্তি আছে। কারণ এই সেদিন ২০১৪ সালের মে মাসে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে গেলেন। সেখানে জাপান ৬০০ কোটি ডলারের ঋণপ্রস্তাব করেছিলো এবং ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো। এর বেশিরভাগ টাকাই বাংলাদেশ পায়নি। চীনের এই ঋণপ্রস্তাবও একই পরিণতি বরণ করতে পারে। তাছাড়া যে সকল প্রকল্পে চীন ঋণ দেবে বলে সম্মতি দিয়েছে, প্রথমত, সে সকল প্রকল্পের যোগ্যতা যাচাই হয়নি। দ্বিতীয়ত, ঋণের শর্ত জানা হয়নি। চীন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত কঠিন শর্ত দিয়ে থাকে। তাছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট' শর্ত থাকে চীনের। অর্থাৎ চীনা ঋণে প্রকল্প চালাতে হলে চীন থেকে মালামাল ও লোকবল নেয়া বাধ্যতামূলক। তৃতীয়ত, এর সুদের হার কত তাও বাংলাদেশ ঠিক করেনি। চীনা ঋণে সাধারণত উচ্চ সুদ থাকে।

এতসব যুক্তি আসছে ঋণকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ধরে নিয়ে। এসকল সমস্যা যদি নাও থাকে, যদি বাংলাদেশ ঠিকঠাক ঋণ পায়, তাহলেও কি দেশের মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে? এই ঋণের টাকা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আসতে আসতে পুরো ঋণের ১০-২০ শতাংশও মানুষের কাজে লাগে না। বিগত সময়ের সকল পরিসংখ্যান এটাই প্রমাণ করে। কিন্তু এই বিরাট ঋণের বোঝা বহন করতে হবে জনগণকে। এবারের বাজেটে ঋণ শোধের পরিমাণ দেখলেই তা বোঝা যায়। আর এ টাকা তোলার জন্য এই বাজেটে ট্যাক্স বসানো হয়েছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ রাস্তার পাশের দোকানে যে কেক, বিস্কুট খায়– সেসবেও।

আরেকটা বিষয় বুঝে রাখা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বা তাদের সংস্থাসমূহ যখন কোনো দেশকে ঋণ দেয়, সেটা সে দেশের উপকারের জন্য নিজেরা ক্ষতি স্বীকার করে দেয়, বিষয়টি কোনোভাবেই এমন নয়। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদের এখন মুমূর্ষু দশা। শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে পুঁজিপতিরা মুনাফার যে পাহাড় জমিয়েছে তাকে খাটানোর আর কোনো জায়গা নেই। তাই সুদের ব্যবসা না করলে বিপুল পরিমাণ এই অর্থকে চালু রাখার আর কোনো উপায় নেই। এজন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে ব্যাংক তৈরি করে, অর্থনৈতিক সংস্থা তৈরি করে ও বিভিন্ন দেশকে ঋণ দেয়। এক সংস্থা কিংবা দেশ থেকে ঋণ নিয়ে আরেক সংস্থা কিংবা দেশকে গ্রহীতা দেশগুলো ঋণ পরিশোধ করে। এভাবে দেশগুলো ঋণের চক্রে পড়ে যায়। এই ঋণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ ঋণগ্রহীতা দেশের রাজনৈতিক বিষয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তাই ঋণ পাওয়া না পাওয়া নিয়ে দেশের মানুষের আনন্দিত কিংবা দুঃখিত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

চীন এশিয়ার মধ্যে নিজের প্রাধান্য ধরে রাখতে চায়

চীন এখন বিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি। সে এশিয়ার দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সহায়তার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ - যাদের উপর সাম্রাজ্যবাদী ভারতের প্রভাব বেশি সেসকল দেশের উপর চীন প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। বিশ্ববাণিজ্য নিয়ে চীনের বিরাট ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশও আছে। কারণ ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। চীনের সিল্ক রুটের যে পরিকল্পনা অর্থাৎ 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রুট' পরিকল্পনার অংশ বাংলাদেশও। এই রুটটি চীনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চীনের জ্বালানী তেলের প্রায় সম্পূর্ণটাই আমদানি করতে হয়। তেল আমদানিতে চীন বিশ্বে প্রথম। এই তেলের ৭০ শতাংশেরও বেশি আমদানি হয় উপসাগরীয় অঞ্চল ও আফ্রিকা থেকে। তাই জ্বালানী নিরাপত্তা বজায় রাখতে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা তাদের দরকার। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সংযোগপথটি চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে শুরু করে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মালদ্বীপের সমুদ্রবন্দরকে যুক্ত করে একবারে সোমালিয়া পর্যন্ত গিয়ে থামবে। এভাবে চীন থেকে ভারত মহাসাগর হয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এই রুটটি চীন বাস্তবায়ন করতে চায়। এটি চীনকে একইসাথে বাণিজ্যিক ও সামরিক সুবিধা দেবে। এটি 'স্ট্রিং অব পার্লস' নামে খ্যাত। এই মুক্তার মালার একটি মুক্তা হল বাংলাদেশে চীনের প্রস্তাবিত সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর। যদিও এর অনুমতি বাংলাদেশ সরকার এখনও চীনকে দেয়নি।

আবার দক্ষিণ চীন সাগরের নিয়ন্ত্রণও চীনের দরকার। কারণ দক্ষিণ চীন সাগর; প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। এই পথে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলারের বাণিজ্য হয়। চীনের নিজের নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ - এ দু'য়ের জন্যই দক্ষিণ চীন সাগরের নিয়ন্ত্রণ তার দরকার। তাই চীন সেখানে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করেছে। দ্বীপটি এতখানি বড় যে এতে যুদ্ধবিমান ওড়ানোর জন্য রানওয়ে পর্যন্ত আছে। দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে চীনের এ ভূমিকার সরাসরি বিরুদ্ধতা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, ব্রুনেইসহ দক্ষিণ চীন সাগরের উপকূলে অবস্থিত দেশসমূহকে নিয়ে চীনকে হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু চীন দক্ষিণ চীন সাগরের কর্তৃত্ব ছাড়তে রাজি নয়। আমেরিকা-জাপানের সাথে এই দ্বন্দ্বে ফিলিপাইন চীনের পাশে আছে। চীন সাধ্যমতো অন্য দেশগুলোকেও পক্ষে টানার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূল চীনের কাছে এসকল কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ভারতের সাথে সম্পর্কে একটা ভারসাম্য তৈরি করলো

ভারতের যে প্রাধান্য বাংলাদেশের উপর ছিলো চীনের সাথে সম্পর্কটা আরেকটু বাড়িয়ে তোলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সেই সম্পর্কটাকে একটা ভারসাম্যে নিয়ে আসলো। ভারতের সাথে, এমনকি আমেরিকার সাথেও তার দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়ালো। চীনা রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফরের সময় ভারতের বিভিন্ন প্রত্রপত্রিকার খবরগুলো খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে ভারত খুবই চিন্তিত। চীনের অর্থনৈতিক ক্ষমতাও ভারত *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ভারতের এনটিপিসির অংশগ্রহণে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে খোলা চিঠি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমরা যথাযথ সম্মান ও শুভেচ্ছাসহ বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষের গভীর উদ্বেগ ও আশংকার বার্তা নিয়ে আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিরক্ষা প্রাচীর, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, অতুলনীয় বাস্তুসংস্থান, বিশ্বের অসাধারণ সম্পদ সুন্দরবন এখন হুমকির মুখে। এর প্রধান কারণ ভারত বাংলাদেশ যৌথ মালিকানায় নির্মিতব্য ১৩২০ মেগাওয়াটের রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

... ভারত সরকারের প্রধান হিসেবে আপনার কাছে বিষয়টি উপস্থাপনও আমরা জরুরী মনে করছি। এর পেছনে প্রধানত দুটো কারণ। প্রথমত, এই প্রকল্পের মুখ্য ভূমিকা ভারতের রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি, ভারতের রাষ্ট্রীয় নির্মাণ কোম্পানী ভেল, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক এবং খুব সম্ভব ভারতের কয়লা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কোল ইন্ডিয়ার। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবন আক্রান্ত হলে ভারতের দিকের সুন্দরবনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

দেশি বিদেশি স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ থেকে আমরা নিশ্চিত যে, এই কেন্দ্র সুন্দরবনের অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। .... সুন্দরবন ও তার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলোর সাথে বনজীবী ও মৎসজীবী হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ লাখ মানুষের জীবন জীবিকা সম্পর্কিত। এই প্রকল্পের ফলে তাঁদের জীবিকা বিপর্যস্ত হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ৪ কোটি মানুষের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে সুন্দরবন। .... এই সর্বনাশ শুধু বাংলাদেশের সুন্দরবনেই সীমিত থাকবে না। তা ভারতের দিকের সুন্দরবনের ৫০ লাখ মানুষকেও বিপদগ্রস্ত করবে। ... এই সর্বনাশ শুধু বর্তমান সময়ের নয়, মানুষ ও প্রাণ প্রকৃতির এই ক্ষতি চিরস্থায়ী, আগামী বহু প্রজন্ম এর শিকার হবে। উন্নয়ন আমাদের দরকার, বিদ্যুৎ আমাদের দরকার। কিন্তু উন্নয়ন ও বিদ্যুতের নামে প্রাণঘাতী, মানুষ ও প্রকৃতির জন্য সর্বনাশা কতিপয় গোষ্ঠীর লোভের বাণিজ্য প্রকল্প কোনো সুস্থ মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। ....

বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, এই প্রকল্পের কারণে সুন্দরবনের ক্ষতি হবে কিন্তু এই প্রকল্প থেকে পিছিয়ে আসার সুযোগ নেই (১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। আমরা আশা করি, এর অর্থ এটা নয় যে, ভারত সরকারের চাপেই বাংলাদেশ সরকার এই সর্বনাশা প্রকল্প করতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা আশা করি আপনার ইতিবাচক ভূমিকার মধ্য দিয়ে এরকম আশংকা মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

ভারতের এনটিপিসি ও বাংলাদেশের পিডিবি যৌথভাবে সুন্দরবনের ১৪ কিমি, এবং বাফার জোন বিবেচনা করলে ইকলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়ার (ইসিএ) ৪ কিমি-র মধ্যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে যাচ্ছে। এছাড়া সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে অবিরাম কয়লাসহ সাজসরঞ্জাম পরিবহণেরও আয়োজন করা হচ্ছে। অথচ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মক পরিবেশ দূষণ ঘটায় বলে সাধারণত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত বনভূমি ও বসতির ১৫ থেকে ২৫ কি:মি: এর মধ্যে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয় না। ভারতের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রণীত পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ গাইড লাইন ম্যানুয়াল ২০১০ অনুযায়ী, কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ২৫ কি:মি: এর মধ্যে কোনো বাঘ/হাতি সংরক্ষণ অঞ্চল, জৈব বৈচিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বনাঞ্চল, জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য কিংবা অন্যকোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চল থাকা অনুমোদন করা হয় না। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ভারতের এই বিধিনিষেধ ও পরিবেশ সচেতনতার কারণে আপনার সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল গত কয়েকবছরে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ ও খনি প্রকল্প স্থগিত বা বাতিল করেছে। বাংলাদেশে ভারতীয় কোম্পানি যে ভারতের আইন ও বিধিমালা ভঙ্গ করেই এই বিদ্যুৎকেন্দ্র করছে সে বিষয়েও আমরা এই চিঠির মাধ্যমে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

..... এই কেন্দ্রের জন্য সুন্দরবনের আঙিনায় বছরে ৪৭ লক্ষ টন কয়লা পোড়ানো হবে এবং প্রতিদিন সুন্দরবনের মুখে থেকে পুরো শরীরের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার টন কয়লা পরিবহণ করা হবে। ৩০ বছরের এই প্রকল্পে কয়লা উঠানো নামানো ও পরিবহণে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হবে না এই দাবি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এই প্রকল্প প্রতিঘন্টায় ৯ হাজার ১৫০ ঘনমিটার পানি নদী থেকে ব্যবহার করবে এবং ৫ হাজার ১৫০ ঘনমিটার পানি আবার নদীতে ফেলবে। কোম্পানি একদিকে দাবি করছে, এই পানি বিশুদ্ধ করে ঠাণ্ডা করা হবে তারপর নদীতে ফেলা হবে, অন্যদিকে কোম্পানির লিখিত বক্তব্যে আছে এই পানি ফেলার কারণে নদীর পানির তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পাবে, যা নদীর প্রাণজগত বিধ্বস্ত করবে। প্রাণবিজ্ঞানীরা বলেন, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ফেলা বিষাক্ত তপ্ত পানিতে পশুর নদীর উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে এই বাস্তুসংস্থানের জুয়োপ্লাংকটনএবং ফাইটোপ্লাংকটন বিধ্বস্ত করে দেবে। এটা একই সাথে মাছ ও পশুর খাদ্যচক্র ধ্বংস করবে। ক্রমান্বয়ে তা সমগ্র বাদাবনের বাস্তুসংস্থান বিপর্যস্ত হবে।

তাছাড়া প্রতিবছর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিষাক্ত পারদ সুন্দরবনকে বিষাক্ত করবে। ইউনিয়ন অব কনসার্নড সাইনটিস্টদের হিসেব অনুসারে, ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে ৩৭৪ পাউন্ড বা ১৬৯.৬৪ কেজি পারদ পানি ও বাতাসে মিশ্রিত হতে পারে। শতকরা ৬০ শতাংশ পারদ নিয়ন্ত্রণ করা হলেও প্রায় ৬৮ কেজি পারদ বাতাসে ও পানিতে মিশবে। এটি পানির মধ্য দিয়ে খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করে পুরো বাস্তুসংস্থানকে নষ্ট করবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, খুবই নিয়ন্ত্রণমূলক প্রযুক্তির উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও কয়লার দূষণকারী উপাদান পানি ও বাতাসে চলে যায়।

.... প্রকৌশলীরা বলেন, আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি কয়লা পোড়ানোর ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করে, তাতে সাবক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির তুলনায় দূষণ কমে শতকরা ৮ থেকে ১০ ভাগ। অন্যান্য দূষণ প্রতিরোধ প্রযুক্তি যদি ব্যবহার করা হয় তারপরও দূষণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও নেই। যেমন, যদি এফজিডি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা হয়তো বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইড দূষণ কমাতে পারবে কিন্তু ব্যবহৃত পানির মাধ্যমে বিস্তীর্ণ পানি আর্সেনিক, মারকারি, সেলেনিয়াম, বোরোনসহ তরলীকৃত এবং কঠিন দূষিত উপাদানে বিষাক্ত হবে। নিম্ন মাত্রার নাইট্রোজেন অক্সাইড চুল্লী ব্যবহার করলে এর দূষণ বড়জোর শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ কমতে পারে। কিন্তু বাকি পরিমাণই সুন্দরবনের ভয়াবহ পরিণতি সৃষ্টি করবে। কোম্পানির পক্ষ থেকে এফজিডি ও ইএসপি-র ব্যবহারের দাবি করা হয়েছে, কিন্তু এগুলোর সমন্বিত ও দক্ষ ব্যবহারও পারদের দূষণ কমাতে পারে বড়জোর গড়ে শতকরা ৪৮ ভাগ। তাতে সুন্দরবনে পারদ দূষণের ভয়ংকর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। পারদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির কথা দরপত্রে নেই।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলেন, এছাড়া আরও কিছু ঝুঁকি আছে যা প্রযুক্তি দিয়ে ঠেকানো যায় না। যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কয়লা পরিবহন থেকে শব্দ ও পানি দূষণ, ফ্লাই এ্যাশ থেকে দূষণ, বা ছাই এর পুকুর থেকে উপচে পড়ে পানি দূষণ। এছাড়া আছে দুর্ঘটনার আশংকা। গত কয়বছরে সুন্দরবনের ভেতরের নদীতেই অনেকগুলো নৌ-দুর্ঘটনা হয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে সুন্দরবনে ...

বাস্তবে প্রযুক্তি যতোই উন্নত হোক, প্রতিবেশগত সংবেদনশীল বনের জন্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মক ক্ষতিকর হবেই। এই হুমকি আরও বৃদ্ধি পায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বল ভূমিকার কারণে। এক্ষেত্রে আমরা কোম্পানি বা তদারককারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার রেকর্ড থেকে আরও আশংকিত, ভারতের সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রেনমেন্ট এনটিপিসি সম্পর্কে লাল সংকেত দিয়েছে। আমরা জানি, রাজধানী ঢাকা মহানগরীর চারপাশের নদীতে প্রতিদিন ৯০ হাজার ঘনমিটার দূষিত পানি পড়ছে।

যে সুন্দরবনের কোনো বিকল্প নেই তা নিয়ে আমরা কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারি না। আমরা বরং দাবি করবো এই অতুলনীয় সম্পদকে রক্ষার জন্য বনকে নিজের মতো বাঁচতে দেয়া হোক। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলসহ বৃহত্তর সুন্দরবন এলাকায় দূষণ ও ঝুঁকি সৃষ্টি কারী সকল তৎপরতা বন্ধ করা, নদীপথে ক্ষতিকর দ্রব্যাদি পরিবহন বন্ধ করা, বাতাস দূষণ বন্ধ করতে নিরাপদ এলাকা পর্যন্ত সবধরনের বাণিজ্যিক তৎপরতা বন্ধ করার দাবি তারই অংশ। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প নিজে শুধু ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে আসছে না এটি আরও বনগ্রাসী প্রকল্পকে আকর্ষণ করছে। তাই এই বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন রক্ষায় ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

... এসব বিবেচনাতেই বাংলাদেশের মানুষ ছাড়াও ইউনেস্কো, রামসার কর্তৃপক্ষ, ভারতের আই কে গুজরাল নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ এশীয় মানবাধিকার সংগঠনসহ বিশ্বের দেড় শতাধিক সংগঠন এই প্রকল্প বাতিলের দাবি জানিয়েছে। নরওয়ে এই প্রকল্পে অর্থসংস্থান বাতিল করেছে। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবন নিয়ে কোনো দরকষাকষি চলে না। সুন্দরবন নিয়ে আমরা সামান্যতম ঝুঁকিও নিতে পারি না কেননা সুন্দরবন কেবলমাত্র একটাই আছে, আর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বিকল্প স্থান, প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থা খুবই সুলভ এবং তা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। যদি জনমতের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভারতের সাথে একটি কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প ভারত ও শ্রীলঙ্কা সরকার বাতিল করতে পারে তাহলে আরও ভয়াবহ বিপর্যয় ঠেকাতে বাংলাদেশে কেন তা সম্ভব হবে না?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা আমরা কখনো বিস্মৃত হইনি। ১৯৭১ সালে ভারতের সরকার ও জনগণের ভূমিকায় বাংলাদেশের মানুষ একটি বড় আশ্রয় পেয়েছিলেন, তার কারণে বাংলাদেশের মানুষের মনে সবসময়ই একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। কিন্তু আবার ভারতের শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ক্ষোভও আছে বহুবিধ কারণে। ফারাক্কা এর একটি যা সুন্দরবনের জন্য ক্রমেই আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠছে, তারপর আরও বাঁধ, তারপর নদী সংযোগ পরিকল্পনা, অবিরাম সীমান্ত হত্যা, কাঁটাতারের সীমান্ত, বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ দিয়ে বেশি দামে জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য করা, ট্রানজিটের নামে পুরো যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর চেপে বসা ইত্যাদি। সর্বশেষ সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প। আগেরগুলো সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে, তারপরও মানুষ আশা নিয়ে থাকে হয়তো এসবের সমাধান একদিন পাওয়া যাবে।

কিন্তু রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে যখন সুন্দরবনের বিনাশ ঘটবে সেই ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকবে না, সুন্দরবনের এই ক্ষতি আর কোনোকিছু দিয়েই পূরণ করা যাবে না। ফলে তখন মানুষের তীব্র ক্ষোভ চিরস্থায়ী হবে। বন্ধুত্ব নাম দিয়ে তৈরি কোম্পানি হবে বৈরীতা চিরস্থায়ীকরণের মাধ্যম। আমরা চাই না এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি হোক। সেজন্য আমরা চাই দুইদেশের দীর্ঘমেয়াদী বন্ধুত্বের স্বার্থেই বাংলাদেশ ও ভারতের সরকার দ্রুত এই প্রকল্প থেকে সরে আসবেন। আমরা এখনও আশা করি, সমমর্যাদার ভিত্তিতে দুইদেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হবে, বন্ধুত্ব হবে প্রকৃতই পরস্পরের বিকাশমুখি।

অতএব দুইদেশের মানুষের স্বার্থ এবং বিশ্বের এক অসাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যৌথভাবে আপনি এই প্রকল্প বাতিলে দ্রুত উদ্যোগ নেবেন বলে আমরা আশা করি।

ধন্যবাদসহ,

তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও
বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষে

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
আহবায়ক

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ
সদস্য সচিব

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে
ঢাকা-কুড়িগ্রাম রোডমার্চ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের পানি প্রত্যাহার, বাংলাদেশ সরকারের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি এবং ভারতের আগ্রাসী পানি নীতির বিরুদ্ধে ২-৫ অক্টোবর ঢাকা-কুড়িগ্রাম রোডমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২ অক্টোবর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ম. ইনামুল হক, দৈনিক সমকালের সহ-সম্পাদক এবং নদী রক্ষা আন্দোলনের সংগঠক শেখ রোকন, ত্রৈমাসিক নতুন দিগন্ত পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মজহারুল ইসলাম বাবলা, বাসদ(মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য সাইফুজ্জামান সাকন।

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী বলেন, 'বাংলাদেশ নদী দিয়ে গঠিত। ফলে বাংলাদেশের পরিবেশ-প্রকৃতি এবং তার সাথে যুক্ত দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নদী প্রবাহের উপর। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সরকার নদী নিয়ে, দেশের পানি সম্পদ নিয়ে কোনো কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি। প্রতিবেশী দেশ ভারত তাদের আগ্রাসী পানি নীতি বহাল রেখেছে স্বাধীনতা পূর্ব এবং তার পরবর্তীতে। ভারত থেকে আসা সবগুলো নদীতেই তারা বাঁধ দিয়েছে। এর আগে পরীক্ষামূলক চালুর কথা বলে ফারাক্কা নদীতে তারা বাঁধ দিয়েছিল। ফারাক্কা নদীতে দেয়া বাঁধের কুফল আজও বাংলাদেশের মানুষ ভোগ করছে। এ বছরে উত্তরবঙ্গে

রোডমার্চের আরও খবর আরও চিত্র পৃষ্ঠা ৬

হতদরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা কেজির চাল বিতরণে অনিয়ম-দুর্নীতি
বাসদ (মার্কসবাদী) এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের বিক্ষোভ

হতদরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা কেজির চাল বিতরণের ঘোষণা দিয়ে জনদরদী সাজছে সরকার, অথচ এই চাল গরীব মানুষ পাচ্ছে না। খোলাবাজারে বিক্রি হচ্ছে গরীবের বরাদ্দ। চাল গ্রহণকারীর তালিকায় আলিশান বাড়ির মালিকরাও আছেন। সারাদেশে পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কৃষকদের নিয়ে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ২৩ অক্টোবর শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে দলীয় কার্যালয় চত্বরে জেলা কমিটির আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য প্রভাষক গোলাম সাদেক লেবু, প্রভাষক কাজী আবু রাহেন শফিউল্যাহ, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, শামীম আরা মিনা প্রমুখ।

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চীনের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর নিয়ে কিছু কথা

গত কিছুদিন আগে চীনের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। দেশের পত্র-পত্রিকায় একে ঐতিহাসিক সফর, বাংলাদেশের জন্য বিরাট সুযোগ ও সফলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বার খুলে গেল – ইত্যাদি শ্রুতিমধুর শব্দরাজি ও অলংকার সহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আমাদের ছোট এই দেশে আগমন যে কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধার করার নিমিত্তে নয় – একথা দেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষমাত্রেই জানেন। চীনের রাষ্ট্রপতির সফরের নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে। বাংলাদেশের সরকারেরও নিজস্ব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু দুপক্ষই মুখে বলছেন বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া – ইত্যাদি অফিসিয়াল কথা। আমরা এ প্রবন্ধে এ সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, চীন ও বাংলাদেশের দিক থেকে আলাদা আলাদাভাবে কী তাই দেখানোর চেষ্টা করবো।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা মানে জনগণের উপর আরও ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া

সহযোগিতার নামে কি হয় এই আলোচনায় আমরা পরে যাব, কিন্তু চীনের ঋণ দেয়াটাকে যদি একটা বিরাট প্রাপ্তি হিসেবে আমরা ধরে নেই এবং যদি মনে করি যে, যত বেশি ঋণ পাওয়া যাবে ততই বাংলাদেশের লাভ; তাহলেও আমরা দেখতে পাব, এই সফরের আগে ও পরে দু'দেশের অফিসিয়াল কথাবার্তার মধ্যে কত ফারাক বিদ্যমান। চীনের প্রেসিডেন্ট আসার আগে পত্রপত্রিকায় লেখা হলো যে, প্রায় ৪০০০ কোটি ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং সেটি হবে বাংলাদেশের সর্বকালের সবচেয়ে বড় ঋণচুক্তি। কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল চুক্তি হলো ২৪০০ কোটি ডলারের। এই ২৪০০ কোটি ডলার ঋণ বাংলাদেশ সরকার কবে পাবে? তার শর্তগুলি কী কী?

(৬ ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

খাদিজার উপর বর্বর হামলা স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে এ সমাজে নারীর স্থান কোথায়!

গত ৩ অক্টোবর সিলেটের এম.সি.কলেজ ক্যাম্পাসে ঘটে গেল এক নৃশংস ঘটনা। সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিস এম.সি. কলেজে এসেছিলো পরীক্ষা দিতে। সেখানে শত শত মানুষের সামনে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলম খাদিজাকে চাপাতি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। ভয়ঙ্করভাবে আহত খাদিজা প্রথমে কয়েকদিন ধরে স্কয়ার হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে মৃত্যুর সাথে লড়াই করেছে এবং এখনও চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার পর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এম.সি.কলেজ ক্যাম্পাস, সিলেট শহর ও শাহ্জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফ্রন্ট বদরুলকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিঃষ্কারের দাবি তুলে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে গত ৬ অক্টোবর'১৬ বিকাল ৪ টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সংহতি সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক তামান্না আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইশরাত রাহী রিশতার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিলেটের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার ব্যক্তিবর্গ। প্রত্যেকেই তাদের হৃদয়ের গভীর ব্যথার প্রকাশ ঘটান এ সংহতি সমাবেশে। বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আরশ আলী, ওয়ার্কাস পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য সিকান্দার আলী, বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার সদস্য এডভোকেট হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অম্বরীশ দত্ত, মিশফাক আহমেদ মিশু, সংগীত শিল্পী ও শিক্ষক অনিমেষ বিজয় চৌধুরী, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক রজত গুপ্ত, সুজন সিলেট জেলার সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন সিলেট প্রতিনিধি সাংবাদিক আল-আজাদ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সরকার সোহেল রানা, ডাঃ নমিতা দাশ সানি, প্রকৌশলী সোহাগ পারভেজ, এডভোকেট উজ্জ্বল রায়, শাহ্জালাল ইন্সটিটিউট অব বিজনেস টেকনোলজির প্রভাষক অনীক ধর, সিটি স্কুল এন্ড কলেজ

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধের দাবি ছাত্র ফ্রন্টের

গাইবান্ধাঃ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ সেপ্টেম্বর শহরের ১নং ট্রাফিক মোড়ে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে। জেলা শাখার সভাপতি শামীম আরা মিনার সভাপতিত্বে মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক পরমানন্দ দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুব আলম মিলন, এসএসসি পরীক্ষার্থী জুলফিকার আলী, আল আমিন, ঝলক মিয়া প্রমুখ।

চট্টগ্রামঃ নগর শাখার উদ্যোগে গত ২৪ অক্টোবর বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট চত্বরে সমাবেশ ও জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নগর সভাপতি তাজ নাহার রিপন ও পরিচালনা করেন নগর সাধারণ সম্পাদক আরিফ মঈন উদ্দিন। আরো বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নগর সহ সভাপতি মুক্তা ভট্টাচার্য, সাংগঠনিক সম্পাদক দীপা মজুমদার।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org। ই-মেইল : mail@spbm.org